র‍্যাডিক্যাল

www.radicalsocialist.in/radical

সপ্তম বর্ষ, সাধারণ ধর্মঘট সংখ্যা, আগস্ট, ২০১৫

২রা সেপ্টেম্বরের সারা ভারত সাধারণ ধর্মঘট সফল করুন

ভারতীয় জনতা পার্টি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতার বলে বলীয়ান হয়ে দিল্লীর গদিতে এখন ক্ষমতায় এক উগ্র দক্ষিণপন্থী সরকার। ক্ষমতায় আসার এক বছরের কিছু বেশি সময় পর, শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে তার একটা বড় রকম মোকাবিলা হতে চলেছে। বিজেপি ও তার পিছনে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘকে আমরা ফ্যাসিবাদী মনে করি। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, তারা সরকারে আসার পর দিনই ভারতবর্ষে হিটলারী-রাজ কায়েম হয়ে গেল! গণতন্ত্রকে খর্ব করার প্রচেষ্টা চলছে প্রতিদিন। একদিকে হিন্দুত্ব আর অন্যদিকে পুঁজির স্বার্থবাহী রাজনীতি চাপানো— সেই কাজও চলছে রোজ। কিন্তু তার শ্রেণী সংগ্রামের দিকটা সহজে উচ্চারিত হচ্ছে না—কারণ বুর্জোয়া উদারনীতি এবং ফ্যাসিবাদ এক জায়গায় একমত। সেটা হল, শ্রমিকশ্রেণীর উপর ''সংস্কার'' চাপিয়ে মুনাফা বাড়াতে হবে (যে প্রক্রিয়াকে বলা হচ্ছে ''উন্নয়ন'')। তাই আগামী ২রা সেপ্টেম্বর, ২০১৫ ট্রেড ইউনিয়নগুলির ডাকে যে একদিনের সাধারণ ধর্মঘট হতে চলেছে, তার বিষয়ে আলোচনা করা জরুরী।

কেন এই ধর্মঘট?

২৬শে মে, ২০১৫ তারিখে নয়াদিল্লীর মন্ডলঙ্কর অডিটোরিয়ামে ১১টি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন এবং ৫০টি কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের জাতীয় ফেডারেশনগুলির ডাকে আহুত একটি জাতীয় কনভেনশনে বিজেপি সরকারের এক বছরের শ্রমিক-কৃষক বিরোধী, মালিকশ্রেণীর মুনাফা বৃদ্ধিকারী নীতির প্রতিবাদে একদিনের সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়।

ইউ.পি.এ. সরকারের সময়েই ট্রেড-ইউনিয়নরা ১০ দফা দাবীসনদ পেশ করেছিল। সেই সব দাবী নিয়ে ২০১০, ২০১২ ও ২০১৩ সালে তিনবার দেশজোড়া ধর্মঘট হয়েছিল। সেই দাবীগুলি নিয়ে যেমন ইউ.পি.এ. সরকার নীরব ছিল, আজকের মোদী নেতৃত্বাধীন এন.ডি.এ. সরকারও উচ্চবাচ্য করছে না। ভারতীয় শ্রম সম্মেলনগুলির একের পর এক সভায় গৃহীত ত্রিপাক্ষিক সিদ্ধান্ত লাগু করার ব্যাপারেও এন.ডি.এ. এবং ইউ.পি.এ.—দুয়েরই সমান আপত্তি।

কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির সাধারণ দাবী এবং কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনগুলির দাবী, এই দুটি দাবীসনদ প্রথমে সংক্ষেপে দেখা জরুরী। শ্রমিক ধর্মঘট হলেই বুর্জোয়া সংবাদপত্র, টেলিভিশন—সর্বত্র চীৎকার ওঠে— এরা অর্থনীতির ক্ষতি করছে। সবচেয়ে দরিদ্র এবং তাঁদের চেয়ে একটু উপরে থাকা শ্রমিক-কর্মচারীর মধ্যে দ্বন্দ্ব বাড়াবার চেষ্টা করা হয়। তাই দাবীগুলি প্রথমে খুঁটিয়ে দেখা দরকার।

কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির ১২ দফা দাবী ঃ

১। সার্বজনীন গণ-বন্টন ব্যবস্থা চালু করে মূল্যবৃদ্ধি রোধ এবং খাদ্যদ্রব্যের উপর ফরোয়ার্ড-ট্রেডিং-র মতো ফাটকাবাজি নিষিদ্ধ করা।

২। কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নিয়ে বেকারত্ব দূর করা।

৩। কোনো ছাড় না দিয়ে সমস্ত বুনিয়াদী শ্রম আইন কঠোরভাবে লাগু করতে হবে এবং শ্রম আইন ভঙ্গকারীদের কঠোর শাস্তি দিতে হবে।

৪। সমস্ত শ্রমিকের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা।

৫। ন্যূনতম মজুরী মাসে কমপক্ষে ১৫,০০০ টাকা এবং মূল্যসূচক অনুযায়ী তার বৃদ্ধি।

৬। সমস্ত শ্রমজীবির জন্য গ্যারান্টিযুক্ত কমপক্ষে ৩০০০ টাকা মাসিক পেনশন।

৭। কেন্দ্র ও রাজ্যের রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির বিলগ্নীকরণ বন্ধ করা।

৮। স্থায়ী চরিত্রের কাজকে ঠিকা/কন্ট্র্যাক্ট কাজে রূপান্তর বন্ধ করা এবং এক বা সমধর্মী কাজের জন্য কন্ট্র্যাক্ট শ্রমিকদের স্থায়ী শ্রমিকের মতো মজুরী ও সুবিধা দেওয়া।

৯। বোনাস ও প্রভিডেন্ট ফান্ডের ক্ষেত্রে প্রদেয় টাকা এবং যোগ্যতার ক্ষেত্রে সমস্ত উর্দ্ধসীমা বাতিল করা; গ্রাচুইটির পরিমাণ বাড়ানো।

১০। আবেদন করার ৪৫ দিনের মধ্যে ট্রেড-ইউনিয়নের বাধ্যতামূলক নিবন্ধিকরণ (Compulsory Registration); আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (ILO)-র ৮৭ এবং ৯৮ কনভেনশন অবিলম্বে মেনে নেওয়া।

১১। শ্রম আইন সংশোধনের বিরুদ্ধে।

১২। রেল, বীমা ও প্রতিরক্ষায় প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগ (FDI)-র বিরুদ্ধে।

কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনগুলির ১০ দফা দাবী ঃ

১। জে.সি.এম. (কর্মচারীপক্ষ)-র দাবীসনদ মেনে ১.১.২০১৪ থেকে বেতন সংশোধন কার্যকর করা; প্রতি পাঁচ বছর অন্তর বেতন সংশোধন করা; মূল বেতনে ১০০ শতাংশ মহার্ঘভাতার সংযুক্তিকরণ ও অন্তবর্তী ভাতা প্রদান; গ্রামীণ ডাক সেবকদের ৭ম বেতন কমিশনের আওতায় আনা; ৬ষ্ঠ বেতন কমিশনের অসঙ্গতিগুলির নিষ্পত্তি করা।

২। রেল এবং প্রতিরক্ষায় কোনো বেসরকারীকরণ, রাষ্ট্র-ব্যক্তি যৌথ বিনিয়োগ (PPP) বা প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগ (FDI) চলবে না; ডাক-ব্যবস্থার কর্পোরেটকরণ চলবে না।

৩। নতুন পদসৃষ্টির উপর নিষেধাজ্ঞা নয়; সমস্ত শূন্যপদে লোক নিয়োগ করা।

৪। পি.এফ.আর.ডি. আইন (PFRDA) বাতিল করা এবং নির্ধারিত বিধিবদ্ধ পেনশন ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তন করা।

৫। সরকারী কাজের আউটসোর্সিং, কন্ট্র্যাক্টকরণ, বেসরকারীকরণ বন্ধ করা; কেন্দ্রীয় সরকারের ছাপাখানা, প্রকাশনা বিভাগ, ফর্ম-স্টোরস্, স্টেশনারী বিভাগ ও মেডিকেল স্টোরস্ বন্ধ করে দেবার প্রস্তাব প্রত্যাহার করা; কর্মরত দৈনিক মজুরীর ভিত্তিতে নিযুক্ত শ্রমিক/ক্যাজুয়াল ও কন্ট্র্যাক্ট শ্রমিকদের নিয়মিতকরণ এবং শিক্ষানবীশদের স্থায়ীপদে নিয়োগ করা।

৬। সমস্ত স্তরে যৌথ আলোচনা ব্যবস্থা (JCM) ফিরিয়ে আনা।

৭। মৃত/অক্ষম কর্মচারীর পোষ্যের নিয়োগের ক্ষেত্রে সংখ্যাগত সীমা প্রত্যাহার করা।

৮। শ্রমিক স্বার্থবিরোধী শ্রম-আইন সংস্কার বাতিল করা।

৯। বোনাসের ক্ষেত্রে উর্দ্ধসীমা (সিলিং) হঠানো।

১০। সমগ্র চাকরীজীবনে পাঁচবার পদোন্নতি সুনিশ্চিত করা।

এই দাবীগুলি দেখলে কয়েকটি কথা বোঝা যায়। সাধারণভাবে ট্রেড-ইউনিয়নরা নিজেদের সদস্যদের কথাই বলে। কিন্তু এই দাবীগুলির কয়েকটি সমস্ত শ্রমিকশ্রেণী, এমনকি সমস্ত শ্রমজীবি মানুষের স্বার্থে তোলা দাবী।

গণ-বন্টন ব্যবস্থা ঃ

সরকারের যুক্তি হলো, যাদের টাকা দেওয়ার ক্ষমতা আছে, তাঁদের কেন ভর্তুকি দিয়ে রেশন দেওয়া হবে? এইভাবে ''দারিদ্র্য সীমার নীচে'' বা BPL স্তর তৈরি করে এক বিশাল অংশের মানুষকে রেশন ব্যবস্থার আওতার বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আমাদের বক্তব্য— ধনীদের উপর প্রত্যক্ষ কর বাড়িয়ে সরকার তার আয় বাড়াক। তার মাধ্যমে প্রতিটি মানুষকেই রেশনের চাল, গম, ডাল, সাবান ইত্যাদি দেওয়া হোক। আমরা মনে করি, মুকেশ বা অনিল আম্বানি যদি রেশন দোকানে লাইন দিতে বা রেশনের চালের ভাত খেতে রাজি থাকেন, তবে তাদের রেশন দেওয়া হোক না! সার্বজনীন রেশন ব্যবস্থা চালু করতে গেলে সরকারকে যে ''ভর্তুকি'' দিতে হবে, সেটা আম্বানী-আদানী-টাটা-বিড়লাদের উপর কর বাড়িয়ে আনা হোক।

কর্মসংস্থান ঃ

একমাত্র রাষ্ট্রই প্রতিদিন মুনাফার হিসেব না করে চাকরির সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে। তাই সরকারী বিনিয়োগ বাড়িয়েই কর্মসংস্থান এবং বেকার সমস্যার সমাধান সম্ভব।

ন্যূনতম ১৫০০০ টাকা মজুরী এবং ৩০০০ টাকা পেনশন ঃ

এই দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে একটা প্রশ্ন তুলে শ্রমিকদের মধ্যে বিভাজন ঘটানোর চেষ্টা চলছে। তা হল, এর ফলে জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি পাবে। ক্ষেতমজুরদের মজুরী বাড়লে চাল-ডাল-শাক-সবজির দাম বাড়বে। বিভিন্ন পরিষেবার জন্য আরো দাম দিতে হবে। গৃহ পরিচারক- পরিচারিকার মাইনে বাড়াতে হবে। পরিবহণ ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত শ্রমিকদের মাইনে বৃদ্ধির ফলে পরিবহণ খরচ বাড়বে। এই যুক্তি খাটে না— কারণ শুধুমাত্র অসংগঠিত ক্ষেত্রের জন্য ১৫,০০০ টাকা ও ৩০০০ টাকার দাবীই তোলা হয়নি। সবকটি দাবী মিলিয়েই দাবী-সনদ, যাতে সংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক-কর্মচারীর বেতন বৃদ্ধির দাবীও আছে। ভারতে এখন কার্যতঃ ১০ শতাংশ শ্রমিকও সংগঠিত ক্ষেত্রে নেই। এক বিপুল অংশের বহু ধরণের অসংগঠিত শ্রমিকদের জন্যই এই দাবী করা হচ্ছে— ভারতে শ্রমিক আন্দোলনের জন্য এর গুরুত্ব অপরিসীম। দ্বিতীয়ত, এ কথা অনস্বীকার্য যে বহু শ্রমিক, গৃহশ্রমিক অথবা বিভিন্ন শিল্পের কন্ট্র্যাক্ট-শ্রমিক হোন, এক মালিকের কাছে সারাজীবন চাকরি করেন না। তাই এই দাবীগুলির বর্শামুখ ব্যক্তি-মালিকের চেয়ে মালিকশ্রেণীর প্রতিনিধি যে রাষ্ট্র, তার দিকেই ফেরানো। প্রত্যেক শ্রমজীবিকে অবসরের পর মাসিক পেনশন দিতে হলে রাষ্ট্রকে তার দায়িত্ব নিতে হবে।

এরপর আছে বিশ্বায়ন ও তার সাথে যুক্ত শ্রমিক-বিরোধী আক্রমণ সম্পর্কে দাবীগুলি—

- স্থায়ী পদে কাজ কমানো ও কন্ট্র্যাক্ট প্রথায় কাজ বাড়ানোর বিরোধিতা;
- রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং বেসরকারীকরণ-বিলগ্নীকরণ বন্ধ করা;

● *২-র পাতায়*

শ্রম আইন সংশোধন, ভারতীয় পুঁজিবাদ ও মোদী সরকার

বিশ্বায়ন পর্বের সূচনা থেকেই পুঁজিপতি শ্রেণী চীৎকার করে চলেছে—'ভারতের শ্রম আইন প্রগতির পথে বাধা'। বাস্তবে শ্রম আইন মানা হয় কম। অসংগঠিত ক্ষেত্র, এস.ই.জেড ইত্যাদিতে শ্রম আইন লঙ্ঘন করার বহু উপায় আছে। কিন্তু পুঁজির চরিত্রই হলো, ক্রমাগত মুনাফার হার বাড়ানোর জন্য সবরকম চেষ্টা করা। তাই যে অল্প সংখ্যক আইন সামান্য পরিমাণেও শ্রমিকদের বাঁচায়, তাদের উচ্ছেদ করাই হল ''সংস্কার''-এর দাবী।

কেন্দ্রীয় ট্রেড-ইউনিয়নগুলির ডাকে যে জাতীয় কনভেনশন হয়, তাতে গৃহীত ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছে ঃ

''শ্রম আইনে আমূল পরিবর্তন আনার জন্য সরকারের যে আগ্রাসী লক্ষ্য, তা আর কিছুই নয়, কেবল ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমিককে সবরকম শ্রম আইনের আওতার বাইরে ঠেলে দেওয়ার প্রচেষ্টা এবং তীব্রভাবে ট্রেড-ইউনিয়ন অধিকার খর্ব করার পরিকল্পনা। ...এই সরকার সব শ্রম আইনের অধিকারভিত্তিক উপাদানগুলি হঠিয়ে দিয়ে কর্মক্ষেত্রে পরাধীন শ্রমিক তৈরী করতে চাইছে। পি.এফ এবং ই.এস.আই ভেঙে দেওয়ার উদ্দেশ্যে ই.পি.এফ. ও ই.এস.আই.-কে স্বেচ্ছামূলক করার প্রস্তাব করা হয়েছে...। আর বিপুল সংখ্যক অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের জন্য, পুরনো প্রকল্পগুলিকে নতুন মোড়কে, নতুন নামে আনা হচ্ছে লোক ঠকানোর জন্য। কিন্তু টাকা দেওয়া হচ্ছে না, কার্যকর করার জন্য কাঠামোও তৈরি করা হচ্ছে না।''

২রা সেপ্টেম্বরের সারা ভারত...

● ১-র পাতার পর

আর আছে ইউনিয়ন গড়ে তোলা এবং শ্রমিক স্বার্থে আন্দোলন করার জন্য মৌলিক দাবী অর্থাৎ ILO-র ৮৭, ৯৮ এবং সাম্প্রতিক ১০৪ কনভেনশন স্বীকার করার দাবী। এইসব কনভেনশনের ভিত্তিতে ভারতে আইন প্রণয়ন হলে এসমা-র ধাঁচে ট্রেড-ইউনিয়ন বিরোধী আইন লাগু করা যাবে না এবং সরকারী কর্মীদের পূর্ণ ট্রেড-ইউনিয়ন অধিকার ও ধর্মঘটের অধিকার দিতে হবে।

এসবের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত হয়েছে শ্রম আইন সংশোধন না করার দাবী। এ নিয়ে স্বতন্ত্র আলোচনা জরুরী।

কিন্তু তার আগে একটা মূল জায়গা ধরতে হবে। ১৯৯১ সালে পি.ভি. নরসিংহ রাওয়ের প্রধানমন্ত্রীত্বে মনমোহন সিং প্রমুখ যে নীতি চালু করেছিলেন, সেই সময় থেকেই আমরা শুনে আসছি কিছু কথা। তা হল, বিশ্বায়ন তথা রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিয়ে উদারনীতি বৃদ্ধির ফলে যে বিরাট উন্নয়ন হবে, তা চুঁইয়ে নিচের দিকেও নামবে। নিচের তলার মানুষেরও উপকার করবে। ২৫ বছর কেটে যাওয়ার পর এখন হিসেবটা নেওয়ার সময় এসেছে।

১০-১৫ বছর নয়া নীতি চলার পর, অর্থাৎ ২০০১ থেকে ২০০৫, এই পাঁচ বছরে, আন্তর্জাতিক অর্থ ভান্ডারের (IMF) হিসেবে গড় বার্ষিক মোট জাতীয় আয় বেড়েছিল ৬.৫ শতাংশ হারে। কিন্তু মজুরী বেড়েছিল ২.৬ শতাংশ হারে। ২০০৬ সালে মজুরী বাড়ে মাত্র ০.৪ শতাংশ এবং ২০০৭ সালে তা কমে যায় ০.৬ শতাংশে। মজুরী কথাটা কিন্তু এখানে একটু ধোঁয়াটে। সরকারী হিসেবে আমলার বেতন, ম্যানেজারের বেতন, সবই ''wages'' কথাটার মধ্যে ঢুকে আছে। অন্য কয়েকটা উপাদান আমাদের পুরো ছবিটা বুঝতে সাহায্য করবে।

	১৯৯০-৯১	২০১০-১১
গাড়ি	১,৮০,০০০	২৯,০০,০০০
বিমানযাত্রী	৮৯,০০,০০০	৫,৭০,০০,০০০
ক্যাবিনেট সচিবের মাসিক বেতন (টাকায়)	৩০,০০০	৯০,০০০
টাটা স্টীলের ম্যানেজিং ডিরেক্টরের বার্ষিক বেতন (টাকায়)	৩৭.৮ লক্ষ	৪.১০ কোটি

অর্থাৎ, উন্নয়নের ফলে দেশের সমৃদ্ধি অবশ্যই এসেছে। কিন্তু সেটা এসেছে উপরের দিকে ১০-১৫ শতাংশ মানুষের কাছে। বিশ্বায়ন কার আয় বাড়িয়েছে, তার সবচেয়ে সরল ছবি দু'জায়গা থেকে পাওয়া যায়। আয়কর ও সম্পত্তিকর থেকে এবং বিশ্ব-সম্পদ রিপোর্ট ও ফোবর্স-র ধনী ব্যক্তিদের তালিকা থেকে।

সাল ২০০৯

	বিলিয়ন মার্কিন ডলার
১০০ জন সবচেয়ে ধনী ভারতীয়ের সম্পদ	২৭৬
১০০ জন সবচেয়ে ধনী চীন নাগরিকের সম্পদ	১৭০

মোট জাতীয় আয়কে যদি ক্রয়ক্ষমতার আপেক্ষিক অনুপাত দিয়ে হিসেব করা হয় তাহলে ২০০৮-এ ভারতের মোট জাতীয় আয় ছিল চীনের অর্ধেকেরও কম (৩.৩০৪ ট্রিলিয়ন ডলার পি পি পি বনাম ৭.৯৯২ ট্রিলিয়ন ডলার পি পি পি)। অর্থাৎ চীনের চেয়ে ভারতে সম্পদ অনেক কঠোরভাবে উপরতলার মুঠোয় ধরা।

সুতরাং, ধর্মঘট ও তার দাবীর পিছনে তথাকথিত ''ইউনিয়নের ধান্দাবাজী'' নেই, নেই কোনো হঠাকারিতাও। আছে শ্রমজীবি মানুষের দীর্ঘ শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে জমে থাকা ক্ষোভ। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে শ্রম আইন পরিবর্তনে মোদী সরকারের পরিকল্পনা ও শ্রমিক প্রতিরোধ।

এই পরস্পরবিরোধী বক্তব্য — মালিক ও সরকার বনাম ইউনিয়ন—এখানে কে ঠিক? ডজন ডজন সংবাদপত্র এবং ডজন ডজন টেলিভিশন চ্যানেলে অজস্র বিশেষজ্ঞ বুঝিয়ে চলেছেন যে সেকেলে শ্রম আইন ভারতের উন্নতির পথে পায়ের বেড়ি।

কোন কোন আইন সংস্কার করার প্রস্তাব করা হচ্ছে? এদের মধ্যে আছে ১৯৪৮-এর ফ্যাক্টরীজ অ্যাক্ট, ১৯৬১-র অ্যাপ্রেন্টিসেস অ্যাক্ট এবং ১৯৮৮-র লেবার ল'জ অ্যাক্ট।

একথা সত্য যে, স্বাধীনতার পর থেকে এমনকি ১৯৯১-র পরবর্তী যুগেও, ভারতের শ্রম আইনগুলি খুব একটা পাল্টায় নি। এইসব আইনের পিছনে যে মূল ধারণাটি আছে, তা হল যেকোনো অ-কৃষি কর্মক্ষেত্রে ১০ জন বা তার বেশি (বিদ্যুৎ ব্যবহার হলে) কিংবা ২০ জন বা তার বেশি (বিদ্যুৎ ব্যবহার না হলে) শ্রমিক থাকলে, কাজের নিয়মকানুন সরকার নিয়ন্ত্রণ করবে। এই ক্ষেত্রকে বলা হয় ''সংগঠিত ক্ষেত্র''।

সংগঠিত ক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠানদের সাধারণতঃ ফ্যাক্টরীজ অ্যাক্ট অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন বা নিবন্ধিকরণ করতে হয়। তার মানে, তত্ত্বগতভাবে, তারা রাজ্য সরকারের ইন্সপেক্টরদের তাদের প্রতিষ্ঠানে আসতে দিতে বাধ্য। এই ক্ষেত্রের বাইরে যারা অর্থাৎ ভারতের শ্রমিকদের কার্যত ৯০ শতাংশ অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক। কাজের ঘন্টা, নারী শ্রমিকের অধিকার, ওভারটাইম ইত্যাদি সম্পর্কিত যত আইনকানুন, সব ঐ ১০ শতাংশ শ্রমিকদের জন্যই খাটে। এই কাঠামোটি তৈরি হয়েছিল ঔপনিবেশিক যুগে ও তার অল্প পরে। একটা আনুষ্ঠানিক দাবী ছিল। সেটা হল, দেশ যত উন্নত হবে, যত আধুনিক হবে, তত সংগঠিত ক্ষেত্র বাড়বে। কিন্তু ১৯৭০-র দশক থেকে বিকাশ হয়েছে উল্টো খাতে।

তা সত্ত্বেও, এই আইনগুলি থাকার একটা তাৎপর্য আছে। আজ মাত্র ১০ শতাংশ এই আইনের আওতায় থাকলেও, তাঁরা যে অধিকার পান, সেটা অন্যদের কাছে একটা সম্ভাবনা হিসেবে দেখা দেয়। ঠিক একই ভাবে বলা যায়, কেন্দ্রীয় সরকারী শ্রমিক-কর্মচারী, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক—এরকম কয়েকটি ক্ষেত্রে নিয়মিত বেতনক্রম ঘোষণা, মহার্ঘ-ভাতা প্রদানের কথা। বুর্জোয়া শ্রেণী, তাদের পেশাদার সাংবাদিক ও অর্থনীতিবিদরা সবাই এই শ্রমিক-কর্মচারীদের আক্রমণ করে। তাঁদের বক্তব্য— এঁরা সুবিধাভোগী। প্রচার করা হয়, এঁরা কাজ না করে মোটা মাইনে পাচ্ছেন। রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র না থাকলে এত সুবিধা থাকতো না, ইত্যাদি।

এই কুযুক্তির একটা বাস্তব দিক আছে। রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে বেতনক্রম, মহার্ঘভাতা, কর্মজীবনে কয়েকটি নিশ্চিত পদোন্নতি, কাজের ঘন্টা, নারী শ্রমিকদের জন্য সামান্য হলেও কিছু সুবিধা যেমন মাতৃত্বকালীন ছুটি বা চাইল্ড কেয়ার লীভ—এইসব অন্য সব শ্রমিক-কর্মচারীর কাছে একটা ভিত্তি (Benchmark) হয়ে দাঁড়ায়, তাঁদের দাবী প্রণয়নের ক্ষেত্রে। এই কারণে, গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন নরেন্দ্র মোদী সপ্তম কেন্দ্রীয় বেতন কমিশন গঠনের বিরোধিতা করেছিলেন। (এরই প্রতিধ্বনি শোনা গিয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে।)

সুতরাং, আইনের গুরুত্ব এইখানে যে শ্রমিকশ্রেণীকে তা লড়াইয়ের জন্য একটু উন্নত জায়গা করে দেয়। সেটা অবহেলা করা কোনো কাজের কথা নয়। বছরের পর বছর ধরে বড় পুঁজিপতিরা দাবী করে আসছে তাদের উপর যে সব নিয়মকানুন আছে, সেগুলো হঠাতে হবে। এর মধ্যে পড়ে ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল ডিস্‌পিউট্‌স্ অ্যাক্ট (IDA) এবং কন্ট্র্যাক্ট লেবার (রেগুলেশন অ্যান্ড অ্যাবলিশন) অ্যাক্টের ধারা পাল্টানো। IDA-তে বলা আছে, ১০০ বা তার বেশী শ্রমিক আছে এমন কারখানায় ছাঁটাই বা ক্লোজারের আগে সরকারের অনুমতি চাইতে হবে। দ্বিতীয় আইনটি চালু শিল্পে কন্ট্র্যাক্ট শ্রমিক ব্যবহারের উপর বিধিনিষেধ আনে। মোদীর প্রস্তাব, ফ্যাক্টরীজ অ্যাক্টে শ্রমিক সংখ্যা ১০ থেকে বাড়িয়ে ৪০ করা হোক। রাজস্থানের বিজেপি সরকার ইতিমধ্যেই একটা কাজ করেছে। কন্ট্র্যাক্ট লেবার অ্যাক্টে যেখানে ২০ বা তার বেশী শ্রমিক আছেন এমন প্রতিষ্ঠানের কথা বলা ছিল—রাজস্থান সরকার তাকে বাড়িয়ে ৫০ বা তার বেশীতে নিয়ে গেছে। IDA-তে ছাঁটাইয়ের ক্ষেত্রে তারা কারখানায় ন্যূনতম শ্রমিক সংখ্যা ৩০০ না হলে রাজ্য সরকারের সম্মতি চাওয়ার প্রয়োজন নেই বলে জানিয়েছে। অ্যাপ্রেন্টিস পর্বে বিনা বাধায় শ্রমিক ছাঁটাইয়ের অধিকার দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে ক্যাজুয়াল ও কন্ট্র্যাক্ট শ্রমিকদের অ্যাপ্রেন্টিস হিসেবে ধরতে বলেছে। ইউনিয়নের স্বীকৃতি পাওয়াও তারা আরো কঠিন করে তুলেছে।

মোদীর প্রস্তাবিত সংস্কারে কী কী থাকবে? প্রথমত, ছাঁটাই করা সহজ হবে। দ্বিতীয়ত, ধর্মঘট করার জন্য ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা এবং কারাদন্ডের প্রস্তাব আছে। তৃতীয়ত, ইতিমধ্যেই শিশু শ্রমকে আইনী করে দেওয়া হয়েছে।

শিশু শ্রম ঃ

একদিকে ঢাক পিটিয়ে (এবং পরিসংখ্যান দিয়ে জুয়াচুরি করে) দাবী করা হচ্ছে যে দারিদ্র্য কমেছে। অন্যদিকে দারিদ্র্যপীড়িত শিশুদের জন্য সমাজকল্যাণমূলক পদক্ষেপ না নিয়ে, বরঞ্চ শিশুশ্রমকে আইনী করা হলো। নিউ ট্রেড ইউনিয়ন ইনিশিয়েটিভ (NTUI)-র সাধারণ সম্পাদক গৌতম মোদী একটি সাক্ষাৎকারে বিষয়টি দেখেছেন এইভাবে, আনুষ্ঠানিকভাবে একথা বলা হয়েছে যে স্কুলের সময়ের বাইরে পরিবারের মধ্যে শিশুদের কাজ করানো যেতে পারে। যদি স্কুলের ঘন্টার বাইরে শিশুদের শ্রমদান করতে হয়— তাহলে শৈশব এবং

● ৩-র পাতায়

সাধারণ ধর্মঘটের রাজনৈতিক তাৎপর্য ও বিপ্লবী আন্দোলন

১৯৯১-এর সাথে ২০১৫-এর বিশাল ফারাক হয়েছে। ১৯৯১ সালে মূলধারার বামদলগুলি ও তাদের অনুগামী ট্রেড-ইউনিয়ন ও অন্যান্য গণ-সংগঠনের তুলনামূলক আধিপত্য অনেক বেশি ছিল। কিন্তু তারা ক্রমে দিশাহারা হয়ে পড়ছিল। একদিকে আন্তর্জাতিকভাবে এই দলগুলি যে মতাদর্শের অনুসারী তার মূর্ত প্রতীক অর্থাৎ সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন, পূর্ব ইউরোপের আমলাতান্ত্রিক, স্তালিনীয় রাষ্ট্রগুলির পতন। আরেকদিকে ছিল এই দলগুলির দীর্ঘদিনের শ্রেণী সমঝোতার রাজনীতি। বাবরি মসজিদকে কেন্দ্র করে বিজেপি-র উত্থানের ফলে এরা তাই নয়া-উদারপন্থার প্রথম দফা আক্রমণের সময়ে যথাযথ লড়াইয়ের জায়গায় ছিল না। বস্তুত, বিশ্বায়নকে নিছক সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির স্বার্থ হিসেবে দেখার অর্থ, ভারতীয় ধনিক শ্রেণী কতটা নিজেদের স্বার্থে এই নয়ানীতি গ্রহণ করেছিল, তা আদৌ না বোঝা। অথচ, আন্তর্জাতিক পুঁজির তা বুঝতে কোনো ভুল হয় নি। বিশ্ব ব্যাঙ্কের রিপোর্ট ছিল যে ভারতের ক্ষেত্রে, তাদের পরামর্শ চাপানোর জন্য লড়তে হয় নি। বরং সরকারি কর্তারা নিজেরাই ঐ ধরণের প্রস্তাব করতে থাকেন। এর মানে দাঁড়ায়, নয়া-উদারপন্থা ভারতের ক্ষেত্রে ভারতীয় পুঁজির সঞ্চয় ও মুনাফা বৃদ্ধির পথ ছিল। ''প্রগতিশীল জাতীয় বুর্জোয়া''-র খোঁজে ব্যস্ত এই সব বামপন্থীরা সেটাই বুঝলেন না।

উপরন্তু, ১৯৯২ থেকে তাঁদের কাছে প্রাধান্য পেল তথাকথিত ''সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী ধর্মনিরপেক্ষ যুক্তফ্রন্ট''। অর্থাৎ, কাজের ক্ষেত্রে নরসিংহ রাও-এর নয়া-উদারপন্থাকে 'মন্দের ভাল' বলে সমর্থন করা। তারপর করা হল মারাত্মক সব কাজ—একের পর এক। 'যুক্তফ্রন্ট' সরকারে অংশ নিল সি.পি.আই। সমর্থন করলো সি.পি.আই. (এম) এবং আর.এস.পি.। অথচ এই সরকারের অর্থনৈতিক দিশার কর্ণধার ছিলেন স্বয়ং চিদাম্বরম। এই সরকারের সম্পর্কে মানুষের ব্যাপক হতাশার ফলে সম্ভব হলো প্রথমবার বাজপেয়ীর নেতৃত্বে এন.ডি.এ সরকারের ক্ষমতায় আসা। এন.ডি.এ. সরকারের নীতির ফলে যে গণ-অসন্তোষ দেখা দিল, তার জোয়ারে, কোনো লড়াই না করে কেবল লড়াইয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েই, বাম দলগুলি ভারতের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশী সংখ্যক আসন পেল ২০০৪-এর লোকসভা নির্বাচনে। কিন্তু অতঃপর আবার তারা কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউ.পি.এ.-কে সমর্থন করলো। এই ইউ.পি.এ. সরকারের আমলে যে নয়া উদারনীতি চলেছিল সে বিষয়ে তারা শুধু নীরবই ছিল না, বরং যেখানে তারা ক্ষমতায় (যেমন পশ্চিমবঙ্গে), সেখানে একই নীতি চালু করতে চেয়েছিল।

কিন্তু ১৯৯১-এর তুলনায় ২০০৯ বা এখনকার পরিস্থিতির অনেক

● ৪-র পাতায়

শ্রম আইন সংশোধন...

● ২-র পাতার পর

শিক্ষা— কথাদুটোর মানে কি? দ্বিতীয়ত, পরিবারের সংজ্ঞা কি? 'যৌথ পরিবার'-এর ধারণাকে ব্যবহার করে দূর সম্পর্কের দরিদ্র আত্মীয়দের শিশু সন্তানদের শোষণ করা হবে। তৃতীয়ত, এই শিশুশ্রমের ব্যবহার করে, শিশুদের কম মাইনেতে কাজ করিয়ে, প্রাপ্তবয়স্ক শ্রমিকদের উপর চাপ বাড়ানো হবে। শ্রমের বাজারে তাঁদের মজুরীও এইভাবে কমানো হবে।

অর্থাৎ, শিশু শ্রমে ''সংস্কার''-এর উদ্দেশ্যে সার্বিকভাবে মজুরী কমানো এবং অদক্ষ কাজ বাড়ানো।

ঠিকা শ্রম বা কন্ট্র্যাক্ট লেবার ঃ

ভারতের শ্রমের বাজারে ব্যাপক শ্রমিকই স্বল্পমেয়াদী ঠিকা শ্রমিক। বর্তমানে উৎপাদনী শিল্পভিত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলির ৮৫ শতাংশ কাজ করছে ৫০ জনের কম শ্রমিক নিয়ে। ৫৮ শতাংশ কারাখানায় ৩০ জনের বেশী শ্রমিক নেই। উৎপাদন ক্ষেত্রে নিযুক্ত শ্রমিকদের অর্ধেক স্বল্পমেয়াদী ঠিকা শ্রমিক। সংগঠিত উৎপাদন ক্ষেত্রেও ৮০ শতাংশ শ্রমিকের কোনো লিখিত চুক্তি নেই বা এক বছরের কম সময়ের চুক্তি আছে। এদের এক বিপুল অংশ কাজ করেন সাব-কন্ট্র্যাক্টরদের অধীনে।

সরকারী কাজে এবং সরকার মাইনে দেয় এমন সব কাজেও এখন আনুমানিক ৩০ শতাংশ কর্মী স্বল্পমেয়াদী চুক্তিতে কাজ করেন। যেমন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের প্রতি দশজন পিছু চারজন এখন অস্থায়ী শিক্ষক।

দেশের তিন কোটি ষাট লাখ কন্ট্র্যাক্ট শ্রমিকদের মধ্যে মাত্র ৬০ লাখ এখন কন্ট্র্যাক্ট লেবার (রেগুলেশন অ্যান্ড অ্যাবলিশন) অ্যাক্ট, ১৯৭০-র আওতায় পড়েন। মোদী সরকার যে সংস্কার প্রস্তাব করেছে তাতে যে সব প্রতিষ্ঠানে ৫০ জনের কম শ্রমিক, তারা এই আইনের আওতায় পড়বেন না। স্পষ্টতই, এই আইন সংস্কার হলে আরো বহু শ্রমিক কন্ট্র্যাক্টরের দয়ায় পড়বেন।

ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠান ঃ

স্মল ফ্যাক্টরীজ (রেগুলেশন অফ এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড কন্ডিশন অফ সার্ভিসেস) বিল, ২০১৪ মারফৎ ''ছোট'' ফ্যাক্টরীর সংজ্ঞা দিতে চাওয়া হয়েছে ৪০-এর কম সংখ্যক শ্রমিক কাজ করেন এমন কর্মক্ষেত্রকে। ''আইন সরল করা''-র অজুহাত দেখিয়ে ১৪টি গুরুত্বপূর্ণ আইনের আওতা থেকে এই সব কারখানাকে বার করে নিয়ে যাওয়া হবে।

১৯৯১-এর পরবর্তীকালে যত নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে, তার বড় অংশই অসংগঠিত ক্ষেত্রে। প্রস্তাবিত সংস্কারগুলি ঐ ক্ষেত্রের মালিকদের ক্ষমতা বাড়াবে।

ফ্যাক্টরী পরিদর্শন ও ''স্ব-শংসাকরণ'' (Self-Certification) ঃ

শিল্পপতি ও ব্যাঙ্কারদের মুখে প্রায়ই শোনা যায় ''ইনস্‌পেকশন রাজ'' বলে একটা কথা। ইনস্‌পেকশন বা পরিদর্শন নানা রকম হতে পারে। কিন্তু ভারতে প্রায় কখনোই একটা যথাযথ শ্রম-পরিদর্শন ব্যবস্থা ছিল না। ২০১২ সালে, ন্যূনতম মজুরী আইন যথাযথভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে কিনা, তা দেখার জন্য ৭৭ লাখ প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করার জন্য নিযুক্ত ছিলেন মাত্র ৩১৭১ জন ইনস্‌পেক্টর! বোঝাই যায়, বাস্তবে পরিদর্শনের কাজ খুব বেশি হয় নি। সরকারী হিসেব অনুযায়ী, ১৯৮৬ সালে ৬৩ শতাংশ ফ্যাক্টরীতে পরিদর্শন হয়েছিল। ২০০৮ সালে এটি কমে দাঁড়ায় মাত্র ১৭.৮৮ শতাংশতে!

ভূপাল গ্যাস কান্ডের ৩১ বছর পরেও, ভারতের শিল্পক্ষেত্রে নিরাপত্তা সচেতনতা অতি নিম্নমানের। বরোদার হেমা কেমিক্যালসের মামলায় সুপ্রীম কোর্টের তৈরি করা কমিটিই বলেছিল ৭৭,০০০ টনের বেশি বিপজ্জনক বর্জ্য পদার্থের পাহাড় তৈরি করেছে ঐ প্রতিষ্ঠানের মালিক।

এই অবস্থায় নির্লজ্জের মত মোদী সরকার প্রস্তাব করেছে ''স্ব-শংসাকরণ''-র। এর অর্থ হল, মালিক বছর বছর নিজেই নিজেকে সার্টিফিকেট দেবে যে তার প্রতিষ্ঠান সব আইন মেনে চলছে। কখনো কখনো হঠাৎ পরিদর্শন হতে পারে (প্রতি বছর নয়)। যদি তাতে প্রমাণিত হয় যে মালিক মিথ্যা বলেছে তবে তার কড়া শাস্তি হতে পারে। যেমন হয়েছিল ভূপাল কান্ডের পর ইউনিয়ন কার্বাইডের মালিকের ও ম্যানেজারদের? বাস্তবে, এর ফলে কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা, পানীয় জল, আট ঘন্টার শ্রমদিবস, যথাযথ শৌচ-ব্যবস্থা, ওভারটাইমে কাজের জন্য বাড়তি মজুরী, সবেতন ছুটি— সবই আরো বিপন্ন হয়ে পড়বে।

গুজরাট মডেল ঃ

২০১৪-এ লোকসভা নির্বাচনের আগে বার বার বলা হয়েছিল যে দেশের উন্নয়নের পথ দেখাবে 'গুজরাট মডেল'। ''উন্নয়ন''-র মানে তাহলে কী? গুজরাট শিল্প বিরোধ (সংশোধন) আইন, ২০০৪ এবং গুজরাট বিশেষ অর্থনৈতিক ক্ষেত্র আইন মারফৎ দেশের অধিকাংশ শ্রম আইন গুজরাটে লাগু ছিল না। এস.ই.জেডগুলি জাতীয় শ্রম আইনের নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকলেও, তাতে বিরাট চাকরি সৃষ্টি হয় নি। কিন্তু মালিকদের মুনাফা বেড়েছে। দ্বিতীয়ত, এই এস.ই.জেডগুলি নির্মিত হয়েছিল বিপুল পরিমাণ জমি দখল করে। সর্বভারতীয় স্তরে সেই কাজ করতে চাওয়ায় প্রবল প্রতিরোধ গড়ে উঠেছে। এমনকী বুর্জোয়া বিরোধী দলগুলি পর্যন্ত ঐ চাপের ফলে সুযোগ বুঝে সংসদে হৈ-হট্টগোল শুরু করেছে।

কি ছিল এই গুজরাট মডেল? ২০১২ সালে জ্যোতি কর্মচারী মন্ডল বলে একটি স্বাধীন ট্রেড-ইউনিয়নের কর্মীরা তথ্যের অধিকার আইন অনুযায়ী গুজরাট সরকারের ''স্বামী বিবেকানন্দ যুব কর্মসংস্থান সপ্তাহ'' সম্পর্কে জানতে চান। গুজরাট সরকার দাবী করেছিল যে ৬৫,০০০ যুবক-যুবতীকে রোজগার মেলার মাধ্যমে চাকরি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু জেলাভিত্তিক আর.টি.আই. করে দেখা যায় মোট চাকরির সংখ্যা ৫১,৫৮৭। এর মধ্যে আবার ১১,১৭২ জন অ্যাপ্রেন্টিস (অর্থাৎ শিক্ষানবীশ পর্ব শেষ হলে ঐ সংস্থায় চাকরি থাকার সামান্যতম গ্যারান্টি নেই)। বাকী থাকে ৪০,৪১৫ জন। এদের সবার চাকরি হয়েছিল কি? সরকার তা দাবী করলেও নাম-ধাম দিতে পেরেছিল মাত্র ৩২, ৩৭২ জনের। আর.টি.আই থেকে আরও জানা যায় যে একজনকেও নিয়োগপত্র দেওয়া হয়নি। কার্যত সরকারী টাকায় (১,৮৭,৭০,০০০ টাকা) প্রধানতঃ বেসরকারী ক্ষেত্রের জন্য কম বেতনের কিছু মজুর জোগাড় করা হয়েছিল। এই মডেলকেই এখন সর্বভারতীয় রূপ দিতে চায় মোদী সরকার।

পরিবেশ ও শ্রমিকের স্বাস্থ্য ঃ

এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে আরেকটা জরুরী বিষয়। একথা অনস্বীকার্য যে গুজরাটে ১৯৬০ সালে শিল্প সীমাবদ্ধ ছিল আমেদাবাদ, বরোদা, সুরাট ও রাজকোট—এই চারটি শহরে। খনিজ তেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাস আবিষ্কারের পর পরিস্থিতি পাল্টায়। বর্তমানে গুজরাটে ভারতের মোট রাসায়নিক উৎপাদনের ৫১ শতাংশ তৈরি হয়। গোটা রাজ্যে যত কর্মসংস্থান, তার পাঁচ ভাগের এক ভাগ এই শিল্পকে ঘিরে। কিন্তু ভূপাল গ্যাস কান্ডের এতকাল পরেও গুজরাট সরকার শিল্পক্ষেত্রে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা করে না। ২০০৯ সালে কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ (CPCB) এবং আই.আই.টি. (দিল্লী) এলাকা দূষণের মাত্রা নির্ধারণের এক নতুন পদ্ধতি স্থির করে, যার নাম 'সর্বাত্মক পরিবেশ দূষণ সূচক' (CEPI)। ২০০৯ সালে, গুজরাটের আঙ্কেলেশ্বর শিল্পাঞ্চল ভারতের 'সংকটজনক দূষিত এলাকা'-র তালিকায় প্রথম স্থান অধিকার করে (৮৮.৫০ CEPI)। ২০১১ এবং ২০১৩ সালে আবার গুজরাটের ভাপি শিল্পাঞ্চল প্রথম হয় (৮৫.৩১ CEPI)। ২০১৩ সালে গুজরাটে ফ্যাক্টরীজ অ্যাক্টে নথীভুক্ত যে ৩০,৩১০টি কারখানা ছিল— তার মধ্যে ৪,৫৫৯টিই বিপজ্জনক রাসায়নিক কারখানা বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল। অথচ গুজরাটে কোনো 'রাসায়নিক মোকাবিলা পরিকল্পনা' আগেও ছিল না, এখনও নেই। গুজরাট মডেলের সর্বভারতীয়করণের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে মোদী সরকার ইতিমধ্যেই দেশের বিভিন্ন স্থানে শিল্পস্থাপনে পরিবেশ সংক্রান্ত বিধিনিষেধ অনেক শিথিল করে দিয়েছে।

তাই শ্রম আইন ''সংস্কার'' কথাটির অর্থ শ্রমিকদের স্বাস্থ্য, মজুরী, কাজের পরিবেশ উন্নত করা দূরে থাক, রক্ষা করাও নয়। বরং ট্রেড-ইউনিয়ন ধ্বংস করা। শোষণ তীব্রতর করা। মজুরী আরো কমানো। শিশু শ্রম বাড়ানো। ২রা সেপ্টেম্বরের ধর্মঘট তাই এক জরুরী পদক্ষেপ।

সাধারণ ধর্মঘটের.... ● ৩-র পাতার পর

পরিবর্তন ঘটেছে। একদিকে সংসদে সি.পি.আই.-সি.পি.আই. (এম) ইত্যাদি দলের আপেক্ষিক গুরুত্ব কমেছে। শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গেও তাদের সম্পর্কও আগের তুলনায় দুর্বল— মতাদর্শগত বা সাংগঠনিক নিয়ন্ত্রণ কম।

ইতিমধ্যে একটা গোটা নতুন প্রজন্মের শ্রমিক বড় হয়েছে। শ্রমিকরা চাকরি হারাচ্ছেন। ব্যাপক সংখ্যক শ্রমিককে কন্ট্র্যাক্ট শ্রমিকে পরিণত করা হচ্ছে। শ্রমিকদের মধ্য থেকে তীব্র চাপ আসতে থাকে। শুধু ১৯৯১ থেকে ২০০৬-র মধ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে ৮,৭০,০০০টি চাকরি কমানো হয়েছে। ১৯৯১ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত ১৬টি এক বা দু'দিনের সারা ভারত ধর্মঘট হয়েছে। এর মধ্যে ২০১০, ২০১২, ২০১৩-র চার বছরে তিনটি বড় মাপের ধর্মঘট হয়েছে।

তলা থেকে লড়াইয়ের চাপ এবং লড়াইয়ের জন্য ঐক্যের চাপ— নানা ক্ষেত্রে আসছে। চা বাগানে যে দীর্ঘ লড়াই হল, তা ঐ তলা থেকে চাপের জন্যই। চটকলে ও হোসিয়ারী শিল্পেও সমস্ত ইউনিয়ন এক সাধারণ মঞ্চ তৈরী করতে বাধ্য হয়েছে। আই.এন.টি.ইউ.সি এবং বি.এম.এস.-কেও তাদের নিজেদের দলের সরকারের বিরুদ্ধে ধর্মঘটের রাস্তায় যেতে হচ্ছে সেটা এই চাপেরই ফলে।

কিন্তু, বিপ্লবী সংগঠন ও তাদের কর্মীরা বলবেন, এ সব লড়াই, এ সব জোটের সীমাবদ্ধতা তো প্রমাণিত।

এখানেই যাচাই হবে কে বা কারা, বিপ্লবী রণকৌশল ও রণনীতি নির্ধারণ করে সেই পথে এগোচ্ছেন। আর কারা, নিছক সুবিধাবাদ এবং সংকীর্ণতাবাদ, এই দুই মেরুর মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছেন।

যখন শ্রমিক আন্দোলন পিছিয়ে আছে, বিপ্লবী রাজনীতি দুর্বল— সেই সময়ে ট্রেড-ইউনিয়ন আন্দোলনের বৃহত্তম অংশ বিপ্লবী হবে— এটা সম্ভব নয়। আর বিপ্লবীরা যদি নিজেদের স্ব-সংজ্ঞায়িত 'বিশুদ্ধতা' বজায় রাখার জন্য দীর্ঘ লড়াইয়ে নামতে রাজি না হন, যদি তাঁরা মনে করেন যে পথের পাশে দাঁড়িয়ে সমালোচনা করাই যথেষ্ট, তবে ইতিহাসের গতি তাঁদের পিছনে ফেলে রেখে যাবে।

তবে, সমস্যাটা কেবল তাঁদের নয়। আমরা গোড়াতেই বলেছি, ফ্যাসীবাদের ধ্বজাধারী এক সরকারের সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণী লড়তে নেমেছে। লড়াই সহজ নয়। কিন্তু এ লড়াই শুরু হতে পারে সেই সব সংগঠনের মাধ্যমে যেগুলি শ্রমিকদের পরিচিত। যেগুলি তাঁদের প্রতিদিনের লড়াইয়ের পাশে থাকবে। আর শত্রু যেখানে একটি-দুটি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নয়, বরং সমগ্র শাসকশ্রেণীর প্রতিনিধি হিসেবে রাষ্ট্র, সেখানে যথোপযুক্ত উত্তর দেওয়া সম্ভব সর্বভারতীয় স্তরেই। ''শুধু একদিনের লড়াই যথেষ্ট নয়''—এই কথাটা ঠিক হতে পারে, কিন্তু অসম্পূর্ণ।

বিপ্লবীরা যদি সংস্কারবাদী নেতৃত্বকে সমালোচনা করায় নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখতে না চান, তাহলে তাঁদের শ্রমিক আন্দোলনের সংগঠকের কাজ বড় আকারে করতে হবে। আপাতভাবে এ কথাটি প্রায় সকলেই স্বীকার করবেন। কিন্তু মারুতি থেকে চা-বাগান, বিভিন্ন ক্ষেত্রের লড়াই দেখিয়ে দেয়, কাজটা কত কঠিন। এক একটা লড়াই গড়ে তোলার জন্য প্রচন্ড উদ্যোগ নিতে হয়। আবার প্রয়োজনে, বিশ্বাসঘাতকতাকে বিশ্বাসঘাতকতা বলে চিহ্নিতও করতে হয়। কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীর কাছে গ্রহণযোগ্যতার জন্য, লড়াইয়ের ভিতরে থেকে, পার্টির পকেট সংগঠন নয়— বরং ব্যাপক শ্রমজীবির প্রকৃত অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠা গণতান্ত্রিক ট্রেড-ইউনিয়ন গড়ে, সেখানে জঙ্গী লড়াই করে যেতে হয়।

একদিনের সর্বভারতীয় ধর্মঘট যেটা পারে তা হল গোটা দেশের শ্রমিকশ্রেণীর কাছে জরুরী প্রশ্নগুলি তুলে ধরা। বিপ্লবীদের অতিরিক্ত কর্তব্য হল—প্রতিটি আংশিক লড়াইয়ে দীর্ঘমেয়াদী প্রসঙ্গগুলি তুলে ধরা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, চা বাগানের লড়াইয়ে শুধু বেশীর ভাগ ইউনিয়নের আত্মসমর্পণের নিন্দা করাটাই যথেষ্ট নয়— বিকল্প তুলে ধরাটাও গুরুত্বপূর্ণ। বা বলা যায়, নিখিল ভারত বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ শিক্ষক সমিতিদের ফেডারেশন যখন বেতনক্রমের দাবীতে লড়াই করবেন, সেখানে পূর্ণ সময়ের অথচ কন্ট্র্যাক্ট শিক্ষকদের এমনকি আংশিক সময়ের শিক্ষকদের প্রসঙ্গ তোলা।

সবচেয়ে জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ যে কাজটা করা দরকার— তা হল অসংগঠিতদের সংগঠিত করা। এই কাজটি করার জন্য ইউনিয়নের মধ্যে ও বাইরে— দু'ভাবে একই সঙ্গে সক্রিয় থাকা দরকার। ট্রেড-ইউনিয়ন সংগঠনের সীমাবদ্ধতা হল সে তার সদস্যদের কথা প্রথমে ভাবে। সেটা ভাবাই স্বাভাবিক। কিন্তু তার ফলে অনেকে বাদ পড়ে যায়। এই কারণেই অসংগঠিতদের সংগঠিত করার কাজে প্রথাগত ইউনিয়নরা দীর্ঘদিন ধরেই অনেক ক্ষেত্রে কম গুরুত্ব দিয়ে আসছিল। কিন্তু অসংগঠিত কন্ট্র্যাক্ট শ্রমিকদের বাদ দিয়ে লড়াই এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাচ্ছিল না। যেমন, ব্যাঙ্কের ATM চালু থাকলে ব্যাঙ্ক ধর্মঘটের কার্যকারিতা কমে যায়। তাই নিজেদের স্বার্থেই স্থায়ী শ্রমিকদের ইউনিয়নগুলি তাদের সংস্থার কন্ট্র্যাক্ট শ্রমিকদের সংগঠিত করার প্রয়োজন উপলব্ধি করে।

জঙ্গী ইউনিয়ন নেতৃত্ব ও বিপ্লবী সংগঠনের কর্মীরা হাত মিলিয়ে তৈরি করবেন বিকল্প সংগঠনের কাঠামো। সর্বভারতীয় আন্দোলন ও ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক প্রচার তীব্রতর করবেন—যাতে স্থানীয় এবং কেন্দ্রীয় প্রসঙ্গ ও দাবীর মেলবন্ধন ঘটে।

এক শতাব্দীরও বেশী আগে, ''সাধারণ ধর্মঘট'' কাকে বলে বোঝাতে গিয়ে রোজা লুক্সেমবুর্গ বলেছিলেন, ''সাধারণ ধর্মঘট একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং একটা গোটা পর্বের শ্রেণী সংগ্রামের কেন্দ্রীয় ধারণা।'' একদিনের প্রতীক ধর্মঘটকে তিনি বলেছিলেন, ''কম গুরুত্বপূর্ণ''। বেশী গুরুত্বপূর্ণ হল কখনো রাজনৈতিক কখনো অর্থনৈতিক সংগ্রামের জোট।

কেবলমাত্র বিপ্লবের যুগে, যখন শ্রেণী সমাজের ভিত্তি ও দেওয়াল কেঁপে ওঠে, তখনই শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক শ্রেণীগত ক্রিয়ার ফলে শ্রেণীর বিরাট অংশ, যারা হয়ত নিষ্ক্রিয় ছিলেন, তাঁরা সবল হন। আমরা আজ সেই পর্যায়ে নেই। কিন্তু ১৯৯১-র তুলনায় আমরা অন্য জায়গায়। শ্রমিকদের এক উল্লেখযোগ্য অংশ লড়তে চান। লড়াইয়ে থেকে, স্থানীয় ধর্মঘট ও সর্বভারতীয় লড়াইয়ের জোট তৈরী করে, আমাদের কাজ বিপ্লবী প্রলেতারীয় নেতৃত্ব গড়া। সংকীর্ণতাবাদী হয়ে পথের পাশে দাঁড়িয়ে লিফলেট বিলি করে বা একটি-দুটি ছোট 'আদর্শ' ইউনিয়ন দেখিয়ে তা করা যাবে না। তেমনি, শ্রেণীগত ফ্রন্টের নামে বামফ্রন্টের সঙ্গে সার্বিক জোট গঠন, আমাদের পথ হতে পারে না। কেননা বামফ্রন্ট, বিশেষ করে সি.পি.আই. (এম), নিয়মানুগভাবে শ্রমিকশ্রেণীকে নিষ্ক্রিয় এবং সংগ্রাম-বিমুখ করার রাজনীতি অনুশীলন করে এসেছে। শ্রমিকশ্রেণীর স্ব-উদ্যোগকে সচেতনভাবে ধ্বংস করেছে। এটা তাদের করার প্রয়োজন হয়েছে ক্ষমতায় আসীন থাকার জন্য এবং এই কারণে নয়া-উদারনীতি চালু করতেও তারা পিছপা হয় নি। বিশেষ করে সি.পি.আই. (এম) নিজের অতীত নিয়ে কোনো অর্থবহ আত্মসমালোচনা তো করেইনি, বরং নতুন করে কীভাবে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বেঁধে তৃণমূল সরকার উচ্ছেদ করা যায়— সেই স্বপ্নে মশগুল (গৌতম দেবের উক্তি, 'এই সময়' সংবাদপত্রে দেবেশ রায়ের প্রবন্ধ ইত্যাদি)। বামফ্রন্টকে তার খসে পড়া ''বাম'' মুখোশ পড়তে সাহায্য করা আমাদের কাজ হতে পারে না। ঠিক একই রকমভাবে আমরা দেখেছিলাম কিছু অবিবেচক বামপন্থী সংগঠন সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম আন্দোলনের সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ''বাম'' মুখোশ পড়তে সাহায্য করেছিল।

বিপ্লবীরা স্বাধীনভাবে, কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীর লড়াইয়ে গভীরভাবে প্রবেশ করবেন, এটাই জরুরী। ২রা সেপ্টেম্বরের দিকে তাকিয়ে এবং তারপরে, এটাই বিপ্লবী আন্দোলনের দিশা হোক।

র‍্যাডিক্যাল সোশ্যালিস্টের পক্ষে মিতুল ধর, আই এ ১৯৯, বিধাননগর, কলকাতা ৭০০ ০৯৭ কর্তৃক প্রকাশিত এবং কোলকাতা মুদ্রণ, ১২, বিপ্লবী পুলিন দাস স্ট্রীট, কলকাতা - ৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত। যোগাযোগ ঃ মিতুল ধর, দূরভাষ ৯০৮৮৮৭৮৩০৯, ই-মেল contact@radicalsocialist.in **সম্পাদক ঃ কুণাল চট্টোপাধ্যায়**
সাহায্য মূল্য ঃ ৩ টাকা